Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 420 - 432
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলার লোকশিল্পের পরিসরে জগন্নাথ

ড. অভিজিৎ পাল
গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : avipal2015@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Lord Jagannath, Jagannath Culture, Folklore, Folk-art, West Bengal, Bengali Culture, Chaitanya Mahaprabhu, Bengali.

Abstract
Around the 8th-9th century, language, art, literature, culture, and the Bengali nation emerged. Along with the progress of the Bengali nation, its own classical and folk art and culture paved the way. In the modern (post-colonial) era, the folk art and culture of Bengal has gained considerable recognition in international folk culture circles. The popular Odia Deity and aslo Bengali Deity lord Jagannath appears in various guises in the multifaceted style of Bengali folk (Lokāyata) art. The idols (Vighraha) of Lord Jagannath are made of different material. These idols made of various materials have been used for worship as well as for decorating the house. The folk or Lokāyata artists of Bengal have given beauty to the idols of Jagannath with their infinite patience and skill. The folk or Lokāyata artists of Bengal have used wood, clay, cloth, thread, paint, metal, conch etc. This work has brought economic success to folk or Lokāyata artists. The Jagannath cult has now become one of the most popular genres in Bengal's folk art or Lokayata-art.

Discussion

অখণ্ড বঙ্গভূমির ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, বহুমুখী ধর্ম-কর্ম-কৃষ্টি ও সর্বোপরি সমৃদ্ধশালী বাংলা ভাষা বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির বলয়ে বঙ্গের সংস্কৃতিকে নিজস্বতার ছাপ রাখতে অনেকটাই সাহায্য করেছে। আনুমানিক অষ্টম-নবম শতাব্দী থেকে বঙ্গদেশ তাঁর ঐতিহ্যবাহী ধ্রুপদী সংস্কৃতি ও লোকায়ত সংস্কৃতিকে সমান তালে পোষণ করেছে। বঙ্গের ধ্রুপদী সংস্কৃতি সমৃদ্ধি পেয়েছিল মূলত বঙ্গের শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়। বঙ্গের হিন্দু-বৌদ্ধযুগ থেকেই বাংলার শিল্পসাধনায় সমৃদ্ধি এসেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় বঙ্গে বহিরাগত তুর্কি মুসলমানদের আক্রমণের পর থেকে একটানা দেড় শতাব্দীর বেশি সময় ধরে বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি হঠাৎই ভীষণভাবে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বঙ্গের ইসলামী শাসনপর্বে একইসঙ্গে প্রাচীন শিল্পের ওপর ধ্বংসলীলা চলেছিল এবং প্রাচীন শিল্পের ক্ষতিগ্রস্ত অংশের ওপর নতুন শিল্প চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অন্যদিকে নতুন শিল্পও তৈরি হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বঙ্গদেশে ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা হলে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পের সঙ্গেও বাংলার শিল্পীরা পরিচিত হয়ে নতুনতর পদ্ধতিতে শিল্প নির্মাণের দক্ষতা অর্জন করে এই নবীন ধারায় কৃতকার্য হয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম দিক থেকে বঙ্গে পাশ্চাত্যের শিল্পশৈলীর অন্ধ অনুকরণ যেমন হয়েছে তেমনই এর প্রায় এক শতাব্দী পরে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশি আন্দোলনের সমসময় থেকে বিদেশি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শিল্পপদ্ধতি সম্পূর্ণ বর্জন না করেও বাঙালি শিল্পীরা বঙ্গের দেশজ শিল্পরীতিকে পুনরাবিষ্কার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য স্বদেশি আন্দোলনের যুগে এই শিল্পধারাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিল অচিরেই। বঙ্গদেশের মূলধারার শিল্পসাধনায় সমান্তরালে নীরবে দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছে বাংলার লোকশিল্প। শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই বাংলার লোকশিল্প সজীব থেকেছে শুধুমাত্র সাধারণ জনজীবনের স্নেহস্পর্শে। লোকশিল্পের জন্মই হয় মূলত সাধারণ মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য। তারপরে সেই প্রচেষ্টায় এসে যুক্ত হয় শিল্পীর নান্দনিক অভিরুচি। লোকশিল্পের জন্ম একনিষ্ঠ শিল্পসাধনার জন্য নয়। একটি জনজাতির মধ্যে লৌকিক পরম্পরায় লোকশিল্পের ধারাটি ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। লোকশিল্প তার নিজস্বতার জন্য মহাকালের দরবারে অক্ষয় আসন অর্জন করে। এই সমস্ত রীতিনীতি ও ভাবনা বাংলার নিজস্ব লোকশিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য থেকেছে। কাল পরম্পরায় বাংলার লোকশিল্পের ধারায় বহু নতুন বিষয় সংযুক্ত হয়েছে, আবার বহু বিষয় অপ্রচলিত হয়ে পড়ে একসময় হারিয়ে গেছে। বাংলার লোকশিল্পের এই দীর্ঘ যাত্রাপথে কোনো এক সময়ে জগন্নাথের অভিষেক ঘটেছিল। তারপর থেকে আজও শ্রীপতি জগন্নাথ স্বামী বাংলার লোকশিল্পের দরবারে বসে লোকশিল্পের বিভিন্ন ধারায় অক্ষয় সমৃদ্ধি দিয়ে চলেছেন।

১. বাংলায় দারুব্রহ্ম জগন্নাথ : আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় স্কন্দপুরাণ রচিত হয়েছিল।[১] স্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য অংশে সুচিহ্নবাহী মহাদারু (নিমকাঠ) থেকে জগন্নাথ মহাপ্রভুর বিগ্রহ নির্মাণের পৌরাণিক তথা শাস্ত্রীয় নির্দেশ পাওয়া যায়।[২] কমপক্ষে আচার্য আদি শঙ্করের সমকাল থেকে ওড়িশার পুরীতে জগন্নাথের দারুব্রহ্ম স্বরূপই সর্বভারতীয় হিন্দুদের কাছেই পরমারাধ্য হয়ে ওঠেন।[৩] চতুর্দশ শতাব্দীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে প্রাচীন উৎকল (বর্তমান ওড়িশা) থেকে বঙ্গদেশে আগত একদল জগন্নাথের উপাসকের হাত দিয়ে রাঢ়বঙ্গের তুঙ্গভূম অঞ্চলে (বর্তমান বাঁকুড়া) বৃহদ্বঙ্গের প্রথম জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথের দারুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৪] এই ঘটনার কয়েক দশক পরে দৈব-উপায়ে হুগলি জেলার মাহেশের জগন্নাথের দিব্য দারুবিগ্রহের জন্য মহাদারু গঙ্গাবক্ষে ভেসে আসতে দেখতে পেয়েছিলেন বৈষ্ণব মহাজন ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী। ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারীর তত্ত্বাবধানে মাহেশের জগন্নাথের বিগ্রহ তৈরি করা হয়েছিল।[৫] বঙ্গদেশে ইসলামী শাসনের সময় চাঁদ কাজীর মতো বহু সংখ্যক স্থানীয় প্রশাসক ও শাসনব্যবস্থার তত্ত্বাবধায়ক হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর জুলুম করেছিল। চৈতন্যদেব চাঁদ কাজীকে এক বিরাট সমবেত অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ্যে দমন করার পর থেকে কিছুটা হলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণ ও উপাসনার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।[৬] চৈতন্যদেবের পরিকর বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য কমলাকর পিপলাই মাহেশের জগন্নাথের দারুবিগ্রহ সেবার দায়িত্ব লাভ করেছিলেন।[৭] আনুমানিক চৈতন্য মহাপ্রভুর সমসময় থেকে পূর্ববঙ্গের হাণ্ডিয়ালে জগন্নাথ মহাপ্রভুর দারুবিগ্রহে নিত্যপূজা প্রচলিত ছিল।[৮] গৌড়মণ্ডলে নিত্যানন্দ প্রভুর মধ্য দিয়ে চৈতন্যধর্মের মহাপ্লাবন এলে বৈষ্ণব আচার্য জগদীশ পণ্ডিত সহ অনেকেই শ্রীক্ষেত্র থেকে জগন্নাথের দারুবিগ্রহ নিয়ে এসে বঙ্গে জগন্নাথের নিত্য উপাসনার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে চৈতন্য অনুসারী নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত আচার্যের পরম্পরার শিষ্য ও প্রশিষ্যরা নিজেদের শ্রীপাটে জগন্নাথের দারুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সময় থেকেই বঙ্গদেশের মূর্তিশিল্পীরা জগন্নাথ মহাপ্রভুর দারুবিগ্রহ নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। বাঙালি বিগ্রহশিল্পীদের শিল্পসাধনায় গড়ে ওঠা জগন্নাথ বিগ্রহের সঙ্গে পুরীর জগন্নাথদেবের বিগ্রহের অবয়বগত যথেষ্ট মিল থাকলেও দারুলেপ সংস্কারের পর রঙ দিয়ে জগন্নাথের চোখ-মুখ প্রভৃতি অঙ্কণের সময় পার্থক্য তৈরি হতে শুরু করে। ফলে জগন্নাথ মহাপ্রভুর রূপমাধুরীতে বাংলার নিজস্ব পটশিল্পের ছাপ পড়তে থাকে। ওড়িশার শিল্পরীতিতে জগন্নাথ বিগ্রহে বিরাট অক্ষিগোলক আঁকার পরিবর্তে বঙ্গীয় পটচিত্রের মতো আয়তনয়ন। প্রচলিত শব্দবন্ধে যাকে পটলচেরা চোখ বলা হয়। অবশ্য দেববিগ্রহের এই ধরনের চোখ মৃৎশিল্পের ঘরাণাতেও সুলভ ছিল। আনুমানিক এই সময় থেকে বাংলার নিজস্ব ও লৌকিক শিল্পশৈলীতে সেজে ওঠেন জগন্নাথ। বঙ্গের জগন্নাথ বিগ্রহের পরম্পরায় এই শিল্পশৈলীটি অনতি পরবর্তী সময়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষ করে আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র অনুসারে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় অবস্থিত একাধিক প্রাচীন বৈষ্ণব শ্রীপাট, পাটবাড়ি ও মন্দিরে যে কয়েকজন প্রাচীন দারুব্রহ্মে জগন্নাথ রয়েছেন তাঁদের মধ্যেও বাংলার দারুশিল্পের নিজস্ব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছাপ রয়েছে। এই ধারাটি কমপক্ষে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও অব্যহত ছিল। এরপর থেকে বঙ্গেও ক্রমশ বাঙালি দারুশিল্পীরা মূলত পৃষ্ঠপোষকের চাহিদা অনুসারে বঙ্গ ও ওড়িশার উভয় শিল্পরীতিতে জগন্নাথ বিগ্রহ তৈরি করেছেন। বঙ্গের বহু স্থানেই ওড়িশা রীতিতে বাঙালি শিল্পীর হাতে তৈরি করা জগন্নাথ যথাবিহিত নিয়ম মেনে আজও পূজিত হয়ে চলেছেন। এই দুটি ধারার মিশ্ররীতিও বঙ্গে প্রসারিত হয়ে পড়েছে। বঙ্গের বেশ কিছু মন্দির ও শ্রীপাটের জগন্নাথ বিগ্রহে এই মিশ্ররীতির বিগ্রহ দেখা যায়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হুগলি জেলার তড়া-আঁটপুরের শ্রীপাট বা শ্যামসুন্দরের পাটবাড়ি। এই শ্রীপাটের লোকমুখে বহুল প্রচলিত নাম শ্যামের পাট। এই শ্রীপাটের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য তথা মহাপ্রভুর পরিকর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল পরমেশ্বরদাস গোস্বামীর সাধনার ইতিবৃত্ত জড়িয়ে রয়েছে।[৯] তবে বিশেষ করে শ্রীধাম শান্তিপুরের বৈষ্ণব আচার্যদের অধিকাংশ পাটবাড়ি ও পরিবারে সযত্নে লালিত জগন্নাথ বিগ্রহে বঙ্গীয় রীতির আধিক্য দেখা যায়। এছাড়াও বঙ্গের নিজস্ব রীতিতে তৈরি দারুব্রহ্মে জগন্নাথের উপাসনা স্থায়ী হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের অনেক রাজবাড়িতে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বারুইপুর রাজবাড়ি, মহিষাদল রাজবাড়ির জগন্নাথ। দুর্ভাগ্যবশত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের নিজস্ব শৈলীতে নির্মিত জগন্নাথদেবের অনেক বিগ্রহই উপাসকের সচেতন দৃষ্টির অভাবে নতুনতর দারুলেপ সংস্কার ও অঙ্গরাগের সময়ে নিজস্বতা হারিয়েছে। অনেক প্রাচীন মন্দিরে আগেকার দারুবিগ্রহ পরিবর্তন করে নতুন জগন্নাথ বিগ্রহ স্থাপিত হয়েছে। অনেক মন্দিরেই জগন্নাথের পুরানো দারুবিগ্রহটি সযত্নে সংরক্ষিত হয়েছে। এমনই একটি জগন্নাথ বিগ্রহ রয়েছে ডায়মণ্ড হারবারের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। আবার বহু মন্দির কর্তৃপক্ষ সচেতনতার অভাবে জগন্নাথের আদি বিগ্রহটি গঙ্গার জলে অর্পণ করে দিয়েছে। ফলে হারিয়ে গেছে বাংলার নিজস্ব জগন্নাথের দারুবিগ্রহ।

২. দারুশিল্পে (কাষ্ঠশিল্পে) জগন্নাথ : তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর বঙ্গে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বিধর্মীয় দেবতার মূর্তিপূজার বিরোধী শাসকেরা বিভিন্ন মন্দির ও দেববিগ্রহ নষ্ট করে দিয়েছিল। এই সময়ের হিন্দু বাঙালি নিজেদের আরাধ্য দেবতার ভূমি রক্ষার চেষ্টা করেও শাসকের অস্ত্রের মুখে পড়ে হেরে যায়। প্রায় একপ্রকার বাধ্য হয়েই বিভিন্ন মন্দিরের দেববিগ্রহের ওপর আক্রমণ ঠেকানো ও বিগ্রহের শুচিতা রক্ষার জন্য স্থানীয় নদীর জলে অথবা মাটির তলায় লুকিয়ে রাখার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এই কারণেই পরবর্তী সময়ে সারা দেশেই অনেক প্রাচীন দেববিগ্রহ নদীর গর্ভে বা মাটি খনন করে পাওয়া গেছে। মুসলমান শাসকরা দেবমূর্তির পূজার প্রত্যক্ষ বিরোধী ছিলেন। ফলে বঙ্গের শাসকের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা না পেয়ে বঙ্গদেশে নতুন করে সুলক্ষণযুক্ত পাথর বা মূল্যবান ধাতুর দেববিগ্রহ নির্মাণের কাজ এক প্রকার থেমে গিয়েছিল। কিন্তু বঙ্গের লোকসমাজে হিন্দু দেবদেবীর পূজার্চনা কখনও থেমে থাকেনি। মধ্যযুগের সময়পর্বে বিভিন্ন পরিবারে ও গ্রামীণ মন্দিরে নতুন করে আরাধ্য দেবতার দারুবিগ্রহ তৈরি করিয়ে পূজার্চনা প্রচলিত হয়েছিল। দারুবিগ্রহ তৈরি করার বিধি শাস্ত্রসম্মত।[১০] শাস্ত্রসম্মত দারুবিগ্রহ তৈরি করে জগন্নাথদেবের উপাসনা বঙ্গদেশে যেমন প্রচলিত হয়েছে তেমনই বঙ্গীয় লোকশিল্পের বিভিন্ন ধারায় জগন্নাথ নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। লম্বা কাঠের পাটাতনের ওপর প্রয়োজন মতো আলতো খোদাই করে জগন্নাথের অপ্রচলিত মূর্তি বর্ধমান জেলার নতুনগ্রামে তৈরি হয়। এই ধরনের কাঠের জগন্নাথ মূর্তি পূজার কাজে ব্যবহৃত হয় না। মূলত গৃহসজ্জায় তা ব্যবহার করা হয়। বর্ধমান ছাড়াও বর্তমান সময়ে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন শৈলীর কাঠের পুতুল নির্মাতারা কাঠের জগন্নাথ তৈরি করে বিক্রি করছেন। এই ধরনের কাঠের জগন্নাথের একটি নিজস্বতা তৈরি হয়েছে। এই ধরনের জগন্নাথের সঙ্গে ওড়িশা ও বঙ্গ উভয় ধারার জগন্নাথ বিগ্রহেরেই অনুপুঙ্খ মিল নেই। এছাড়াও কাঠের তৈরি বাক্সের অলংকরণে জগন্নাথদেবের মুখাবয়ব খোদাই করা হচ্ছে। কাঠের তৈরি গয়নার বাক্স, দরজা, চাবির বোর্ড এমনকি গৃহের উপযোগী ঠাকুরের আসনেও পূর্ণদেহের জগন্নাথ ও শুধুমাত্র জগন্নাথের মুখ যথেচ্ছ পরিমাণে খোদাই করা হচ্ছে। এছাড়া নদিয়া জেলার শান্তিপুর অঞ্চলে ছোট ছোট রথের উপযোগী কাঠের পুতুলের মতো জগন্নাথ তৈরির রেওয়াজ রয়েছে। এই ধরনের কাঠের জগন্নাথ বিগ্রহ তৈরি করা হয় মূলত মাটির জগন্নাথের অনুকল্পে। অধুনা কাঠের তৈরি ছোট ছোট লক্ষ্মীপ্যাঁচার আকৃতির কাঠের টুকরো প্রথমে রঙ করে তার ওপরে বিভিন্ন রঙের সাহায্যে তাকে জগন্নাথের আকৃতি দেওয়া হয়। এগুলি সাধারণত এক কাঠের হয়। তাই এই ধরনের কাঠের জগন্নাথের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হাত তৈরি করা হয় না। বুকের কাছে একটু পাশ ঘেঁষে শুধুমাত্র রঙ দিয়ে ছোট ছোট দুটি বৃত্ত এঁকেই হাত দুটি বোঝানো হয়।

৩. কাঠের ব্লকে জগন্নাথ : বাংলার প্রকাশনা জগতে তথা বাংলা বইতে ছবির ব্যবহার প্রথম শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। সেই সময় কাঠের তৈরি বিভিন্ন মাপের ব্লকের ওপর শিল্পীরা প্রয়োজন মতো খোদাই করে ছবি ফুটিয়ে তুলতেন। এই ধরনের কাঠের তৈরি ব্লক ছাপাখানার কাজে সরাসরি ব্যবহৃত হত। পৃষ্ঠার ওপর সঠিকভাবে যাতে ছাপ পড়ে ঠিক এমনভাবে সজ্জিত করে ব্লক স্থির করা হত। তারপর ব্লকের ওপর প্রয়োজন মতো রঙের প্রলেপ দিয়ে মেশিনের সাহায্যে তার ছাপ তোলা হত কাগজের ওপর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাঠের ব্লক দিয়ে ছাপা ছবির বই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে তৈরি হওয়া বাংলা জগন্নাথচর্চায় বইতে এর নিদর্শন পাওয়া যায়।[১১] পরবর্তী সময়ে প্রকাশনা জগতে অতি আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হলে হাতে কেটে গড়ে তোলা কাঠের ব্লকের ব্যবহার কমে আসে। কিন্তু এই ধরনের ব্লকের অল্প হলেও ব্যবহার প্রচলিত থেকে যায় দোকানের ব্যাগের নামাঙ্কন, বিজ্ঞাপন, রসিদের বইতে। আধুনিক সময়েও এই ধরনের কাঠের ব্লক তৈরি করা হয়। সাধারণত হাতে ছাপা শাড়ি ও অন্যান্য বস্ত্রের শিল্পসুষমা বৃদ্ধিতে তা ব্যবহার করা হয়। আধুনিক মেশিনে একই ছবির একাধিক এডিটিং ও রঙের ব্যবহারের সুবিধা থাকায় এখন কাঠের ব্লক সাধারণত অর্ডার ছাড়া তৈরি হয় না। এই ধারাটি অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। এক রঙা কাঠের ব্লকে ছাপা জগন্নাথের ছবি বিংশ শতাব্দীতে লিখিত ও মুদ্রিত অনেক জগন্নাথ সাহিত্যেই পাওয়া যায়। ছবিগুলি বাংলা দারুশিল্পী ও পুস্তকশিল্পীদের শিল্প-বোধের অক্ষয় স্মারক হয়ে রয়েছে। এক সময় কাঠের ব্লক দিয়ে কাগজের ওপর মূলত লাল, সবুজ ও কালো কালিতে ছাপা জগন্নাথের ছবি গৃহস্থ পরিবারের সিংহাসনে শোভা পেত। এই সময়ে তৈরি একটি ছবি তড়া-আঁটপুর শ্রীপাটের নাটমঞ্চে দীর্ঘদিন ঝোলানো ছিল। যে কোনো কারণেই হোক বর্তমান সময়ে সেই ছবিটি আর শ্রীপাটে নেই। এই ধরনের কাঠের ব্লকে ছাপা ছবি পুরীধামেও পাওয়া যেত। বিংশ শতাব্দীতেও পুরীযাত্রী বাঙালিরা অনেকেই শ্রীক্ষেত্র থেকে ঘরে ফেরার সময় জগন্নাথ মহাপ্রভুর ছবি ছাপা পট সংগ্রহ করে আনতেন।[১২] আর্টের কাগজের ওপর ছাপা রঙিন ছবি সহজলভ্য হলে কাঠের ব্লকের ছাপ থেকে তৈরি ছাপা ছবি প্রায় অপ্রচলিত হতে শুরু করে।

৪. মৃৎশিল্পে জগন্নাথ : মধ্যযুগের বঙ্গদেশে ইসলামী শাসনের সময়ে পাথর খোদাই করে গড়ে তোলা হিন্দু দেবতার মূর্তিশিল্পে শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হয়ে যায়। প্রস্তরশিল্পের বিপুল ব্যয় বহন করায় অসমর্থ জনগণ পাথরের বিকল্প হিসেবে কাঠকে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলার ভূমি ও আর্দ্র আবহাওয়া কাঠের উপযোগী নয়। বহু যত্ন গড়া দারুবিগ্রহ বিশেষ করে বাতাসের আর্দ্রতার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকে। এর অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন বাংলার যশমাধবের বিগ্রহ। এরপর থেকে প্রায় বাধ্য হয়েই আরেকটি সহজ বিকল্প মানুষ বেছে নিতে থাকে। এই সময়েই অখণ্ড বঙ্গদেশে ভাগবতের শাস্ত্রীয় বিধানের সূত্র ধরে মৃৎবিগ্রহে দেবতার পূজার বিস্তার ঘটতে থাকে।[১৩] মৃৎবিগ্রহে দেবতার পূজার রীতি বঙ্গদেশে সুপ্রাচীন। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের শ্রীমৃন্ময়ী দেবীই তাঁর সবচেয়ে প্রাচীন প্রমাণ। মধ্যযুগের সময়পর্বে চৈতন্যদেব বঙ্গের বাইরে দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গমে সর্বপ্রথম সপার্ষদ জগন্নাথের মৃৎবিগ্রহ তৈরি করে পূজা করেছিলেন।[১৪] জগন্নাথের এই ঐতিহাসিক মৃৎবিগ্রহটি এখনও শ্রীরঙ্গমে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীদের পরিবারের তত্ত্বাবধানে পূজিত ও সংরক্ষিত হয়ে চলেছে। অনুমিত হয়, চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত প্রাগুক্ত মৃৎ-জগন্নাথের সংবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য স্থানীয় অনেক মহাজন বৈষ্ণবই জানতেন। ফলে বঙ্গদেশে গৃহস্থ-ঘরে জগন্নাথের মৃৎবিগ্রহের প্রবেশের পথ খুলে গিয়েছিল। পাথর, কাঠ ও ধাতুর বিগ্রহের তুলনায় মৃৎবিগ্রহ অপেক্ষাকৃত সুলভই ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই জগন্নাথের ছোট-বড় মৃৎবিগ্রহ আপামর বাঙালির কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। নক্‌শা গদ্যশিল্পী হুতোম প্যাঁচা ওরফে কালীপ্রসন্ন সিংহ ঊনবিংশ শতাব্দীর রথের উৎসব প্রসঙ্গে লিখেছেন :

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "...সহরে রথ পার্ব্বণে বড় একটা ঘটা নাই; কিন্তু কলিকাতায় কিছুই ফাঁক যাবার নয়; রথের দিন চিৎপুর রোড লোকারণ্য হয়ে উঠল, ... মাটির জগন্নাথ, কাঁঠাল, তালপাতার ভেঁপু, পাখা ও সোলার পাখি বেধড়ক বিক্রি হচ্চে...।"[১৫]

আষাঢ় মাসের রথযাত্রার সময় উত্তর কলকাতার কুমোরটুলি, দক্ষিণদাড়ি ও মধ্য কলকাতার কালীঘাট সন্নিহিত অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা অসংখ্য শৈলীতে নানা ধরনের ছোট-বড় জগন্নাথ বিগ্রহ তৈরি করেন। এই ধরনের জগন্নাথের মৃৎ-বিগ্রহ যেমন গৃহস্থ-ঘরের পূজার আসনে স্থাপন করে সারা বছর ধরে পূজার কাজে ব্যবহৃত হয় তেমনই শিশুদের ছোট ছোট খেলনা রথের রথস্বামী জগন্নাথ রূপেও মৃৎবিগ্রহে জগন্নাথকে পূজা করা হয়। অঞ্চলে ভেদে মাটির তৈরি জগন্নাথে শিল্পগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। মৃৎশিল্পের বলয়ে ছোট ছোট উপকরণের পার্থক্যে জগন্নাথ বিগ্রহে বৈচিত্র্য আসে। তবে গড়নের দিক থেকে জগন্নাথ বিগ্রহ মূলত দুই প্রকারের। একক জগন্নাথ ও সপার্ষদ জগন্নাথ। একক জগন্নাথের মৃৎবিগ্রহ কম তৈরি করা হলেও নদিয়ার শান্তিপুর অঞ্চলে একক জগন্নাথ উপাসনার রীতি প্রচলিত রয়েছে। তবে বঙ্গের অধিকাংশ জগন্নাথের মৃৎবিগ্রহই সপার্ষদ। মৃৎশিল্পের বলয়ে জগন্নাথের সঙ্গে একত্রে সুভদ্রা দেবী ও বলরামের উপস্থিতিই সহজলভ্য। জগন্নাথের মুখাবয়বের দিক থেকে বিচার করলে জগন্নাথের মুখ নির্মাণের প্রধানত দুই রকমের রীতি বঙ্গে প্রচলিত রয়েছে। কৃষ্ণমুখের জগন্নাথই বঙ্গে বেশি দেখা যায়। এটিই প্রাচীন বঙ্গীয় শৈলী। এক্ষেত্রে জগন্নাথকে ভ্রুযুক্ত আয়তনয়ন, উন্নত নাসা ও দ্বিবিভক্ত ঠোঁট সংযুক্ত অবস্থায় দেখা যায়। অনেক শিল্পী জগন্নাথের কানও তৈরি করেন। বর্তমান সময়ে পুরীর শ্রীমন্দিরের শৈলীতে জগন্নাথের মুখ নির্মাণের প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এই ধরনের বিগ্রহে সরাসরি রঙের সাহায্যে জগন্নাথের মুখের অংশে দুটি গোলাকার চোখ ও আকর্ণ বিস্তৃত অবিভক্ত ঠোঁট আঁকা হয়। জগন্নাথের মুখাবয়ব আরও একটু আকর্ষণীয় করে তুলতে ভ্রুমধ্যে এক বিন্দু তিলক, কপালের কেন্দ্র থেকে গাল পর্যন্ত অর্ধবৃত্তাকারে বধূতিলক ও কপাল থেকে নাসা পর্যন্ত ঐতিহ্যবাহী গৌড়ীয় তিলকের আয়োজন দেখা যায়। বঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলেই জগন্নাথের মৃৎবিগ্রহ তৈরির সময় তাঁকে মোগল-রাজপুত শৈলীর বস্ত্রে সাজানো হয়। ফলে জগন্নাথের মৃৎবিগ্রহগুলিতে তাঁর আজানুলম্বিত বস্ত্রের আড়ালে থাকা তাঁর পা দেখা না গেলেও হাতের অংশটি প্রকাশিত থাকে। বাংলার মৃৎশিল্পের ঘরাণায় মূলত তিনটি ধরনের শৈলীতে জগন্নাথের হাত তৈরি করা হয়। জগন্নাথের অনেক বিগ্রহে দেখা যায় তাঁর পূর্ণবাহু। সাধারণত এই ধরনের বিগ্রহে জগন্নাথের হাত দুটি ঊর্দ্ধে তোলা থাকে। এর সঙ্গে কীর্তনরত চৈতন্যদেবের অবয়বের যথেষ্ট মিল রয়েছে। ঊর্দ্ধবাহু শৈলী ছাড়া অর্ধবাহু শৈলীর জগন্নাথ বিগ্রহও যথেষ্ট সংখ্যক দেখা যায় দক্ষিণবঙ্গে। এক্ষেত্রে জগন্নাথকে সম্পূর্ণ বাহুতে সাজানো না হলেও হাতের অর্ধেকটি ওপরের বা নিচের দিকে তুলে অথবা সামনের দিকে এগিয়ে রাখতে দেখা যায়। এছাড়াও বঙ্গে আর একটি শৈলী প্রচলিত রয়েছে যেখানে জগন্নাথ মহাপ্রভুর হাতের মাত্র কণাংশ দেখা যায়। এক্ষেত্রে বস্ত্রের ওপর কালো রঙের গোলকে শুধুমাত্র বাহুমূলটুকু আঁকা হয়। মৃৎবিগ্রহগুলিতে জগন্নাথ মহাপ্রভুর শরীরে অলংকারের বাহুল্য না থাকলেও মাটির তৈরি মুকুট, কুণ্ডল, কণ্ঠহার, মালা, কটিবন্ধ দেখা যায়। বর্তমান সময়ে মুকুটের পরিবর্তে পাঞ্জাবি শৈলীর পাগড়ির ব্যবহার শুরু হয়েছে। একটু বড় মাপের বিগ্রহে বঙ্গের প্রসিদ্ধ ডাকের সাজ এবং হলুদ রঙের কাগজের ওপর জরির নক্সা তোলা সাজের অলংকার ব্যবহার করা হয়। তাঁর মাথায় ময়ূরের পালক লাগানো হয় বেশ কিছু বিগ্রহে। বঙ্গের জগন্নাথের সঙ্গে রথের একটি সরাসরি সংযোগ রয়েছে। ফলে মাটির জগন্নাথের বিগ্রহে অনেক সময় তাঁকে ঘোড়া, হাতি, হরিণ, রাজহাঁস চালিত রথে বসা অবস্থায় দেখা যায়। শুধুমাত্র চারচাকা বিশিষ্ট সোনালী রথের ওপর জগন্নাথের বসা বিগ্রহও সহজলভ্য। রথের সঙ্গে প্রায় আবশ্যিকভাবে একটি জয়ধ্বজ দেখা যায়। আধুনিক সময়ে জগন্নাথের বিন্যাসের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এসেছে। বলভদ্র ও সুভদ্রা ছাড়াও জগন্নাথের অনুসঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন হনুমান, গরুড়, কৃষ্ণ ও চৈতন্যদেব। এর মধ্যে চৈতন্যদেবের কোলে স্থিত জগন্নাথ বিগ্রহই বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই ধরনের বিগ্রহে চৈতন্যদেব এক হাতে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করে থাকেন অন্যহাতে তিনি মালা জপ করেন। জগন্নাথকে আরও একটু সাজিয়ে তুলতে বিগ্রহের সঙ্গে কখনও রাজছত্র, রাজসিংহাসন যেমন ব্যবহার করা হয় তেমনই বড় পদ্মফুল, সপুষ্প কদমগাছের ব্যবহার করা হয়। বাংলার অধিকাংশ মৃৎ-জগন্নাথই কৃষ্ণবর্ণের। তবে বঙ্গেই স্থানভেদে কাঁচা সবুজ ও আকাশী নীল রঙে মাটির তৈরি জগন্নাথকে রাঙিয়ে তোলার রীতিও রয়েছে। বিশেষত শান্তিপুরের সবুজ জগন্নাথ এদিক থেকে বিশিষ্টতা অর্জন করতে পেরেছে। শান্তিপুরের বড়

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গোস্বামীদের নবদুর্বাদল বর্ণের রঘুনাথ ও জগন্নাথ একত্রে মিশে গেছেন। তাই জগন্নাথ এখানে রামের মতোই সবুজ। উত্তরবঙ্গের কিছু অঞ্চলে সাদা রঙের জগন্নাথ বিগ্রহ পাওয়া গেলেও এই শিল্পরীতিটি বহুল প্রচলিত নয়।[১৬] এছাড়াও জগন্নাথ মহাপ্রভুর অজস্র আধুনিক মৃৎবিগ্রহ তৈরি হয়ে চলেছে। তবে মূল ধারার বা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এখনও বাংলার জগন্নাথ মৃৎশিল্পের বলয়ে সবচেয়ে বেশি সমুজ্জ্বল রয়েছেন। আধুনিক সময়ের অভিঘাতে মাটির বিগ্রহে জগন্নাথ উপাসনার রেওয়াজ কমছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বেলঘরিয়ার মতো প্রাচীন জনপদে বা হাওড়ার বাঁধাঘাটে এখনও জগন্নাথ মহাপ্রভু মৃৎবিগ্রহে মহাসমারোহে পূজিত হয়ে চলেছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাটির তৈরি জগন্নাথের অবয়বে অনেক পার্থক্য তৈরি হলেও বাংলার অন্যতম প্রাচীন লোকশিল্প তথা মৃৎবিগ্রহের ঐতিহ্যবাহী ক্ষয়ীষ্ণু ধারাটি বজায় রয়েছে।

৫. মন্দিরের টেরাকোটায় জগন্নাথ : চৈতন্যদেবের পরিকরদের প্রভাবে গৌড়মণ্ডলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন পোক্ত ভূমি লাভ করেছিল। রাজা বীর হাম্বীরের সময় থেকেই বিষ্ণুপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের প্রভাব পড়তে থাকে। রাজা আদিমল্লের পরবর্তী মল্লরাজারাও অনেকে বৈষ্ণব মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ধীরে ধীরে মল্লরাজাদের ভূমি বিষ্ণুপুরের রাজধর্ম হয়ে ওঠে বৈষ্ণব ধর্ম। বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব ধর্মের আধিপত্যের সময়েই বিভিন্ন দেবদেবীর জন্য পোড়ামাটির শিল্পে (টেরাকোটা) ভরপুর মন্দিরের আয়োজন করেন মল্লরাজারা।[১৭] বিষ্ণুপুরের মানুষদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে, দেবমন্দিরের পবিত্রতা বৃদ্ধি ও রক্ষা করার জন্য এই মন্দিরগুলির অলংকরণে ব্যবহৃত প্রতিটি টেরাকোটা গঙ্গাজল ও গঙ্গামাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দিরগুলির শিল্প-সৌন্দর্য ও মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বিশেষ করে বাংলার বর্ধমান, হুগলি ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন রাজা, জমিদার ও সামন্তরা টেরাকোটার মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী বাংলার টেরাকোটা শিল্পের স্বর্ণময় অধ্যায় রচনা করেছে। বাংলার টেরাকোটা শিল্পে বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারত ও কৃষ্ণের বাল্যলীলার বিভিন্ন ঘটনা গ্রথিত হলেও ধীরে ধীরে কালী, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, ব্রহ্মা, নারায়ণ, দশাবতার, নবগ্রহ, চৈতন্য মহাপ্রভু, সাধারণ নারী-পুরুষ, তাদের বিভিন্ন পেশা, অস্ত্রসজ্জিত সৈনিক, যুদ্ধের দৃশ্য, বাদ্যযন্ত্র, পশু-পাখি, পদ্ম সহ বিভিন্ন ফুল, মঙ্গলঘট, পাতার নক্‌শা টেরাকোটার বিষয় হয়ে উঠতে থাকে। বাংলার খুব বেশি মন্দিরের টেরাকোটার প্যানেলে জগন্নাথকে দেখতে পাওয়া যায় না। তবে বাঁকুড়া জেলার হলদ-নারায়ণপুরের একটি বিষ্ণুমন্দিরের অলংকরণে ব্যবহৃত টেরাকোটার দশাবতার প্যানেলের মধ্যে নবম স্থানে চতুর্বাহু বিশিষ্ট একক জগন্নাথের টেরাকোটা বিগ্রহ রয়েছে। এই মন্দিরের টেরাকোটার প্যানেলে অবস্থিত জগন্নাথের অবয়ব বা রূপের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত দশাবতার তাসের অন্তর্গত বুদ্ধ নামাঙ্কিত জগন্নাথের ছবি বিশিষ্ট তাসে অবস্থিত জগন্নাথের মিল রয়েছে। পূর্ববঙ্গের হাণ্ডিয়ালের জগন্নাথ মন্দিরেও জগন্নাথের মুখ দেখা যায় একটি টেরাকোটা প্যানেলে। হলদ-নারায়ণপুরের টেরাকোটার জগন্নাথের সঙ্গে হাণ্ডিয়ালের টেরাকোটার জগন্নাথের তেমন মিল নেই। বর্তমান সময়ে টেরাকোটার তৈরি ছোট ছোট ব্লক আধুনিক শহুরে গৃহকোণের শোভা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়। এই উদ্দেশ্যে নির্মাতার বাণিজ্যিক লাভ থাকে, তা বলাবাহুল্য। টেরাকোটার সঙ্গে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের সম্পর্ক সুপ্রাচীন। তাই আধুনিক সময়ে তৈরি হওয়া টেরাকোটার দশাবতার পরিকল্পনায় বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস সরাসরি বিষয় হয়ে উঠেছে। এছাড়াও কাঁচামাটির তৈরি বিভিন্ন মূর্তি নির্দিষ্ট উপায়ে ঘুঁটে ও কয়লার আগুনের ধিমে আঁচে রেখে লাল করে আর একটি ধরনের টেরাকোটার মূর্তি তৈরি করা হয়। এই উপায়ে অল্প কিছু জগন্নাথ বিগ্রহ তৈরি করা হচ্ছে। এই ধরনের পোড়ামাটি বা টেরাকোটার জগন্নাথের মূর্তি সাধারণত বিভিন্ন রথের মেলায় দেখা যায়। তবে অন্যান্য মূর্তির মতো জগন্নাথের মূর্তি সারাবছর কেনাবেচা হয় না। তাই এই ধরনের জগন্নাথ বিগ্রহ সেভাবে প্রসার পায়নি। দক্ষিণবঙ্গে জগন্নাথের কাঁচামাটির মূর্তির যে প্রসার দেখা যায় তার তুলনায় পোড়ামাটির তৈরি জগন্নাথের মূর্তির প্রসার প্রায় নেই বললেই চলে। জগন্নাথের মৃৎবিগ্রহের সঙ্গে পূজার্চনার একটি সরাসরি সংযোগ রয়েছে। টেরাকোটার জগন্নাথের বিগ্রহ সাধারণত পূজার কাজে ব্যবহৃত হয় না। পোড়ামাটির বিগ্রহ সাধারণত বিধিপূর্বক পূজিত হয় না। বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র গৃহসজ্জায় উপাদান হিসেবে এই ধরনের টেরাকোটার জগন্নাথের সামান্য একটু প্রসার ঘটেছে। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া অঞ্চলে এই ধরনের টেরাকোটার জগন্নাথ সুলভ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. সরাচিত্রে জগন্নাথ : পশ্চিমবঙ্গে পোড়া মাটির সরায় দেবদেবীর পটচিত্র এঁকে পূজা করার রীতি ছিল না। এই রীতিটি পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত হয়েছে স্বাধীনতার দাম দিতে পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুহারা হয়ে আসা অজস্র বাঙালি হিন্দুর হাত ধরে। উদ্বাস্তু মানুষেরা পূর্ববঙ্গ থেকে তাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে পশ্চিমবঙ্গে বহন করে এনেছিলেন। মূলত তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য ধরেই পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা এত জনপ্রিয় হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের বিশেষত বরিশাল ও ঢাকা অঞ্চলে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মীসরায় দেবীর পূজার রীতি রয়েছে। লক্ষ্মীসরার জনপ্রিয়তার প্রভাব এসে পড়েছে বাংলার জগন্নাথ সংস্কৃতিতে। লক্ষ্মীর সরায় সাধারণত সরার ওপর খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে তার ওপর বেলের বা তেঁতুল বীজের আঠা দিয়ে বিভিন্ন রঙ গুলে তা দিয়ে পটচিত্র আঁকা হয়। মাটির তৈরি লক্ষ্মীসরার আর একটি ধারায় মাটির সরার ওপর ছাঁচের ছাপ ফেলে লক্ষ্মীর অবয়ব তৈরি করে রঙ দেওয়ার রীতি রয়েছে। মূলত কালীঘাট ও পানিহাটি অঞ্চলে এই ধরনের লক্ষ্মীপট তৈরি করা হয়। লক্ষ্মীসরার এই দুই ধারার অনুসরণে জগন্নাথের সরা তৈরির রেওয়াজ তৈরি হয়েছে। একটি ধারায় সরার ওপর সরাসরি একক বা সপার্ষদ জগন্নাথ আঁকা হয়। দ্বিতীয় ধারায় মূল সরার ওপর মাটির তৈরি জগন্নাথের একক বা সপার্ষদ বিগ্রহ জুড়ে দেওয়া থাকে। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় লোকশিল্প উৎসবে এই ধরনের সরার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। লক্ষ্মীসরার মতো জগন্নাথের সরাও পোড়ামাটির তৈরি। লক্ষ্মীসরা যেভাবে লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত সেভাবে জগন্নাথের এই ধরনের সরা জগন্নাথের পূজার সঙ্গে যুক্ত নয়। সরার নান্দনিক সাফল্য রয়েছে বঙ্গে এবং সেই সূত্র ধরেই বাংলার সরাশিল্পে জগন্নাথের গতাগতি শুরু হয়েছে। এছাড়া আর এক ধরনের জগন্নাথের সরায় দুপাশে দুই ময়ূরের মাঝখানে শুধুমাত্র একক জগন্নাথই দেখা যায়। এখানেও জগন্নাথের রঙ মাটির জগন্নাথের ধারার মতোই কালো। তবে জগন্নাথের গয়না ও পশ্চাৎপটে সরায় সরায় বৈচিত্র্য রয়েছে। তবে পুরীর শ্রীমন্দির ও রথের ছবিই জগন্নাথের পটে বেশি দেখা যায়। এছাড়াও শুধুমাত্র ঘন লাল, নীল ও সবুজ পশ্চাৎপটের ওপর সাদা রঙে বাংলার নিজস্ব আলপনার আয়োজনও করা হয়। এপ্রসঙ্গে আর একটি তথ্য পেল করা যেতে পারে, উত্তরবঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এখনও প্রাধান্য থাকায় এই অঞ্চলের অধিকাংশ লক্ষ্মীসরায় রাধা-কৃষ্ণের পটচিত্র আঁকা হয়, রাধা-কৃষ্ণের নিচের প্যানেলে থাকেন লক্ষ্মীদেবী। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় আমরা জানতে পারি মালদহের সামসি অঞ্চল থেকে কর্মসূত্রে কলকাতায় আসা একটি পরিবারের লক্ষ্মীসরায় রাধা-কৃষ্ণের পটের বদলে সপার্ষদ জগন্নাথদেবের উপস্থিতি রয়েছে। সেই পরিবারের কাছে এই ব্যতিক্রমের কারণ জানতে চাওয়ায় এটি তাদের পারিবারিক প্রথা, এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায়নি। লক্ষ্মীসরায় জগন্নাথের পটচিত্র আঁকা হয় না। তাই প্রথমদিকে এই বাড়ির সদস্যরা কুমোরবাড়ি বা পটুয়াদের পাড়ায় কাছে নিজেদের ফরমায়েশ মতো পট আঁকিয়ে নিতেন। এই উপায় না থাকলে এখন পোড়া মাটির সরা বাড়িতে এনে তারা নিজেরাই পটটি এঁকে নেন।

৭. পটশিল্পে জগন্নাথ : দেবতার পট আঁকার রীতি এই বঙ্গে সুপ্রাচীন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন শৈলীর পটচিত্র আঁকা হয়। বাংলার পটশিল্পের বিষয় ও শৈলীগত সারল্য একে বহুকাল ধরে একভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে।[১৭] বাংলার পটশিল্প বাহিত হয়েছে লোকায়ত শিল্পীদের পরিবার ও গুরু-শিষ্য পরম্পরায়। বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের ধারাটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের শিল্পরসজ্ঞদের কাছে বহুল আদৃত হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান সেভাবে হয়নি। বাংলার পটশিল্প যে সুপ্রাচীন সময় থেকেই জনপ্রিয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শান্তিপুরের দেবী পটেশ্বরী। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র শৈলীর পটশিল্প আঁকা হতে থাকে। মূলত শিব, দুর্গা, কালী, কার্তিক, গণেশ ও কলকাতার বাবু সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় হয়ে ওঠে পটের বিষয়বস্তু। এই ধারাতে কোনো এক সময়ে বেশ কয়েকটি সপার্ষদ জগন্নাথের চিত্র আঁকা হয়েছিল। অনুমিত হয় কোনো কোনো শিল্পী কালীঘাটের পটচিত্রের প্রথাগত বিষয়ের ছবিগুলির বাইরে গিয়ে নতুন কিছু আঁকার চেষ্টা করেছিলেন এবং তখন সুভদ্রা-বলরাম সহ প্রভু জগন্নাথ হয়ে উঠেছিলেন নতুনতর পটচিত্রের বিষয়বস্তু। কালীঘাটের পটচিত্র ছাড়াও পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন জায়গার অনেক পটুয়া পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, লৌকিক ও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে দীর্ঘ পট আঁকেন। এই পটগুলি আঁকা হয় পুরানো নরম সুতির কাপড়ের ওপর ক্যানভাস তৈরি করে। এই ধরনের পটচিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গানও বাঁধেন পটুয়ারা। স্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য অংশে জগন্নাথের পৌরাণিক আখ্যান রয়েছে। সেই পৌরাণিক কাহিনির পটচিত্র রূপায়ণ করে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মেদিনীপুর জেলার পটশিল্পীরা দীর্ঘ পট তৈরি করেছেন। এই ধরনের পটের সূত্রেই জগন্নাথের পটের গানগুলি তৈরি হয়েছে। এই গানগুলি লোকসঙ্গীতের অন্তর্গত জগন্নাথগীতি। জগন্নাথের মুখাবয়বের জ্যামিতিক নকশা ও বিচিত্র কম্পোজিশন পটশিল্পকে নতুনতর করে তুলতে সাহায্য করেছে। ওড়িশার রঘুনাথপুরের পটচিত্রে জগন্নাথ মহাপ্রভুর যে সুচারু রূপটি দেখা যায় তার তুলনায় বাংলার পটশিল্পের জগন্নাথ অতি সাধারণ শিল্পনৈপুন্যের অধিকারী। মেদিনীপুরের গোটানো পট বা দীর্ঘ পটের মতো অনুরূপ ভাবনা দেখা যায় পিংলার পটচিত্রে। পিংলার পটচিত্রে উজ্জ্বল রঙের প্রাধান্য থাকে। বাংলার পটশিল্পের শৈলীতে প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায় জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের একটি অনন্য পটচিত্র এঁকেছিলেন। যামিনী রায়ের আঁকা জগন্নাথের পটচিত্রে জগন্নাথকে উৎকলী মুখাবয়বের শৈলীতে দেখা গেলেও সুভদ্রা ও বলরামকে বঙ্গীয় ভঙ্গিতে দেখা যায়।

৮. দশাবতার তাসে জগন্নাথ : বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস বাংলার অন্যতম লোকক্রীড়ার উপকরণ। দশাবতার তাস প্রকরণ, অবয়ব ও খেলার পদ্ধতির দিক থেকে প্রচলিত তাসের (কার্ড গেম) মতো নয়। ওড়িশার মল্লরাজারা এই খেলার সূচনা করেছিলেন।[১৮] গোলাকৃতির এই তাসগুলির পৃথক পৃথক নাম ও চিহ্ন রয়েছে। দশাবতার তাসে রয়েছেন বিষ্ণুর দশজন অবতার। এঁরা হলেন— মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, হলধর, বুদ্ধ (জগন্নাথ), কল্কি।[১৯] বুদ্ধ নামাঙ্কিত দশাবতার তাসে বঙ্গে বহুল প্রচলিত গৌতম বুদ্ধের ছবি দেখা যায় না। এই তাসের নামটি বুদ্ধ হলেও তাসে আঁকা হয় জগন্নাথদেবের চতুর্ভুজ মূর্তি। বাংলায় চতুর্ভুজ জগন্নাথ বিগ্রহ বাগনানের একটি জগন্নাথ মন্দিরে থাকলেও বঙ্গে চতুর্বাহু জগন্নাথের মূর্তি প্রচলিত নেই বললেই চলে। সেদিক থেকে দেখা হলে দশাবতার তাসের জগন্নাথ অনেকটাই ব্যতিক্রমী। দশাবতার তাসে জগন্নাথের আবির্ভাব ঘটেছে খুব সম্ভবত ওড়িশার প্রভাবে। ওড়িশার অধিকাংশ দশাবতার প্যানেলে নারায়ণের নবম অবতার হিসেবে জগন্নাথকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওড়িশার গজপতি মহারাজদের সঙ্গে দীর্ঘদিন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। রাজাদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক থেকেই বিষ্ণুপুরের এই দশাবতার তাসে ওড়িশার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বলে অনুমিত হয়। তাসের ওপর চিত্রিত জগন্নাথের মুখভঙ্গি ওড়িশার পটশৈলীর মতো নয়। জগন্নাথের হাতের ভঙ্গিতেও রয়েছে বাংলার নিজস্ব শৈলী। দশাবতার তাসে জগন্নাথের পা দুটো দেখা যায় না। একটি কাঠের পাটাতনের বা আসনের ওপর জগন্নাথকে বসে থাকতে দেখা যায়। তবে তাসের ওপর জগন্নাথের ছবি আঁকা হলেও তার নাম ঠিক কোন কারণে বুদ্ধ হয়েছে তা শিল্পীরাও নিশ্চিত করে বলতে পারেন না। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের প্রভাবে সম্পূর্ণ বঙ্গেই দশাবতারের পরিকল্পনা একমাত্রিক হয়ে পড়েছে। অনুমিত হয় ওড়িশার দশাবতার পরিকল্পনা ও বাংলার দশাবতার পরিকল্পনার একটি মিশ্র প্রভাব এসে পড়েছিল বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের নির্দেশে তৈরি হওয়া দশাবতার তাসে। ওড়িশার প্রভাবে তাসের ছবিগুলি তৈরি হয়েছে এবং তাসগুলির নামকরণ হয়েছে বাংলার প্রভাবে।

৯. চালচিত্রে জগন্নাথ : সাধারণত দেবদেবীর মূর্তিপূজায় বিগ্রহের সামগ্রিক শোভা বৃদ্ধির জন্য চালচিত্র তৈরি করা হয়। বাংলার ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজায় এখনও নিয়মিত চালচিত্রের ব্যবহার রয়েছে। দুর্গাপূজায় বহুল ব্যবহৃত চালচিত্রে সাধারণত থাকেন শিব, গণেশজননী, নন্দী, ভৃঙ্গী, হরি, ব্রহ্মা, নারদ, দক্ষ, রাম-সীতা-লক্ষ্মণ-হনুমান সহ সমগ্র রাম-দরবার, অষ্টসখী পরিবৃত রাধা-কৃষ্ণ, অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধরত জয়া ও বিজয়া (মতভেদে ঘোররূপা কালী ও অতসীবর্ণা জগদ্ধাত্রী)। এছাড়াও সাবেকি পরিবার ভেদে আরও কয়েকজন দেবদেবীকে চালচিত্রে দেখা যায়। দেবী দুর্গা ছাড়া অন্য শাক্ত দেবীদের বিগ্রহ সজ্জার উপকরণ হিসেবে প্রাগুক্ত চালচিত্রের পরিবর্তে অনেক জায়গায় দশমহাবিদ্যার চালচিত্র ব্যবহার করা হয়। ঠিক একইভাবে কৃষ্ণ বা রামচন্দ্রের পূজার সময় অনেক পরিবারে দশাবতারের চালচিত্র ব্যবহার করেন। দশাবতার তাসের মতোই বাংলার দশাবতার চালচিত্রে বুদ্ধের পরিবর্তে জগন্নাথের চিত্র জায়গা করে নিয়েছে। বর্তমান সময়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে ছাপা চালচিত্রে দেবদেবীর চালা তৈরি করা হয়। কৃষ্ণনগর অঞ্চলের কয়েক ঘর পাল পরিবারের চালচিত্র শিল্পী এখনও নিয়মিত চালচিত্র হাতে আঁকেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা হাতে আঁকা চালচিত্রের যথার্থ অর্থমূল্য না পেতে পেতে চালচিত্র আঁকা ছেড়ে দিচ্ছেন। কম্পিউটারের মাধ্যমে ছাপা বিভিন্ন মাপের চালচিত্রের দাম অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় মৃৎশিল্পীরা বিগ্রহ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সজ্জিত করতে হাতে আঁকা চালচিত্রের ব্যবহার কমিয়ে ফেলেছেন। চালচিত্রের চাহিদা কমে আসার ফলে ও অর্থাগম কমে আসায় অনেক শিল্পীই দশমহাবিদ্যা ও দশাবতার চালচিত্র আঁকা বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় ধারার দেবদেবীর মূর্তিপূজায় বিগ্রহের সজ্জার জন্য দুর্গাপূজায় ব্যবহৃত চালচিত্রেরই ব্যবহার অবশিষ্ট রয়েছে। এখনও শান্তিপুর, নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগর অঞ্চলের কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী পূজায় এই ধরনের পটগুলি দেখা যায়। কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে দশাবতার বা দশমহাবিদ্যার চালচিত্র প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। এখনও যে কয়েকটি জায়গায় দশাবতারের চালচিত্র দেখা যায় সেখানেও বিষ্ণুর দশজন অবতারের মধ্যে নবম অবতার হিসেবে জগন্নাথকে দেখা যায়। দশাবতার চালচিত্রের জগন্নাথের চিত্রে ওড়িশার শিল্পরীতির ছায়া পড়েছে। বাংলার জগন্নাথের নিজস্ব শৈলীটি চালচিত্রশিল্পে লুপ্ত হওয়ার পথে।

১০. ডোকরাশিল্পে জগন্নাথ : বাঁকুড়ার বিকনা গ্রাম ডোকরা শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। বিকনার কর্মকার সম্প্রদায়ের মানুষ ডোকরা শিল্পে সিদ্ধহস্ত। ডোকরার তৈরি দেবমূর্তি পূজার কাজে ব্যবহৃত না হলেও গৃহসজ্জায় তা ব্যবহার করা হয়। বিগত দেড়-দুই দশক ধরে ডোকারা শিল্প আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও চাহিদা অর্জন করতে পেরেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডোকরার কাজেও আধুনিকতার ছোঁয়া পড়েছে এবং বিষয়বৈচিত্র তৈরি হয়েছে। বর্তমান সময়ে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী ডোকরার জগন্নাথ তৈরি করছেন ডোকরা শিল্পীরা। তবে কয়েক দশক আগে যখন ডোকরার জগন্নাথের চাহিদা প্রায় ছিল না তখনও শিল্পী বলাই কর্মকার ডোকরার জগন্নাথ তৈরি করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ডোকরা শিল্পে চাহিদার তুলনায় বিনিয়োগ কম ফলে শিল্পীরা নতুনতর শিল্প তৈরি করতে এখনও কিছুটা দ্বিধান্বিত হন। বলাই কর্মকারের নিজের হাতে তৈরি করা ডোকরার জগন্নাথের মধ্যে ওড়িশা ও বঙ্গীয় ঘরানার জগন্নাথের মিশ্র ছাপ রয়েছে। জগন্নাথের মুখই এখানে প্রধান। মুখের ঠিক নিচেই জগন্নাথের শরীর ও শরীরের দুপাশে দুটি হাতের আভাস পাওয়া যায়। এই জগন্নাথের হাত থাকলেও, পা এখানে নেই। জগন্নাথের মুখের অংশে আবার চোখই প্রধান। দুটি গোলাকৃতির চোখ জগন্নাথের মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

১১. আলপনায় জগন্নাথ : প্রাচীন সময় থেকে বাংলার গৃহস্থ ঘরের লক্ষ্মী উপাসনা ও বিভিন্ন ব্রত-পার্বণ পালনের অঙ্গ হিসেবে নির্দিষ্ট কিছু আলপনা আঁকার রেওয়াজ থাকলেও জগন্নাথ উপাসনার জন্য পৃথকভাবে নির্দিষ্ট কোনো আলপনা আঁকার রীতি নেই। বাংলার আবহমান আলপনার প্রচলিত সাদাসিধে ভাব, রঙ-রূপ ও পিটুলির সাদা রেখার টানকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, নতুনতর, রঙিন, জটিল কলা-কৌশল ও নবীন বিষয়-বৈচিত্র্যে ভরপুর করে তুলেছে শান্তিনিকেতন ঘরানার আলপনা শৈলী। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ঘরানার শিল্পকলার সাবেকি, প্রাতিষ্ঠানিক, ঐতিহ্যবাহী ও লৌকিক ভাবকে গ্রহণ করে তাকে আলপনার মাধ্যমে নতুনতর করে তোলার কাজে শান্তিনিকেতনের পরম্পরার বিশেষ অবদান রয়েছে। ওড়িশার ঐতিহ্যবাহী আলপনার সঙ্গে জগন্নাথের যোগ সুপ্রাচীন। জগন্নাথের রথ, ওড়িশার পটচিত্র ও পিপলির সুতোর শিল্পে জগন্নাথ নান্দনিক আভিজাত্য নিয়ে উপস্থিত থাকেন। বাংলার আলপনার প্রচলিত রূপের মধ্যে জগন্নাথের প্রবেশ ঘটেছে মূলত শান্তিনিকেতনের ঘরানার আলপনা শিল্পীদের হাত ধরে। শান্তিনিকেতনের পরম্পরার আলপনাকে কতটা লোকশিল্পের মধ্যে গণনা করা যেতে পারে তা একটি বিতর্কের বিষয়। কিন্তু বাংলার বৃহত্তর আলপনা শিল্পের বলয়ে জগন্নাথের রূপের এই ধরনের প্রয়োগে শান্তিনিকেতনের পরম্পরার শিল্পীদের অবদান সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের পরম্পরার আলপনা অন্যতম শিল্পী ও শিক্ষক সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি আলপনায় জগন্নাথের রূপ ফুটিয়ে তুলতে সিদ্ধহস্ত।

১২. পুথির পাটা ও পৃষ্ঠায় জগন্নাথ : প্রাক্-ঔপনিবেশিক সময়পর্বে বিদ্যাচর্চার প্রধান লিখিত উপকরণ ছিল পুথি। হাতে লেখা পুথির অলংকরণ বা অঙ্গসজ্জার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম সেভাবে নেই। বঙ্গদেশে মধ্যযুগের সময়পর্বে লেখা অসংখ্য বাংলা ও সংস্কৃত পুথিতে যথেষ্ট পরিমাণে হাতে আঁকা অলংকরণ দেখা যায়। উত্তর চব্বিশ পরগনার বিশেষ করে ভাটপাড়া এলাকায় বাংলা লিপিতে অনুলিপি হওয়া সংস্কৃত ভাষার উৎকলখণ্ডের পুথিতে জগন্নাথের মাত্র কিছু হাতে আঁকা ছবি দেখা যায়। পুথির বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুথির পাতায় ও পুথির দুপাশে থাকা কাঠের পাটাতনের ওপর জগন্নাথের আঁকা

ছবি দেখা যায়। সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসা সহজিয়া সাধিকা ক্ষেমঙ্করী মাতাজীর ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা সাধককবি গোপালচন্দ্র গোঁসাই-এর 'শ্রীজগন্নাথবিজয়' কাব্যের মূল পুথির একটি পাতায় জগন্নাথের ছবি আঁকা রয়েছে। এই পুথির অলংকরণে চিত্রিত উক্ত জগন্নাথের ছবিতে বাংলার নিজস্ব শৈলীতে দুই হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকা জগন্নাথের অবয়বই ধরা পড়ে।

১৩. বাসনে জগন্নাথ : বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই কাঠের ব্লকে খোদাই করে নীল বা কালো রঙে ছাপা জগন্নাথের ছবি এবং বিভিন্ন শিল্পীর হাতে আঁকা পটচিত্রের জগন্নাথ বাঙালির ঘরে প্রবেশ করেছিল। এছাড়া মাটির জগন্নাথের বিগ্রহও ততদিনে সমগ্র বঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে পুরী অঞ্চলে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ছোট ছোট চাকতির ওপর সপার্ষদ জগন্নাথের ছবি ছাপা হতে থাকে। এই সময়ের মধ্যেই পুরীর স্মারক হিসেবে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ছোট বড় থালায় 'পুরীর স্মৃতি', 'পুরীধাম', 'পুরীতীর্থ', 'জয় জগন্নাথ' প্রভৃতি কথা লেখা অ্যালুমিনিয়ামের বাসন সংগ্রহ করার একটি প্রবণতা বাঙালি সমাজে তৈরি হয়েছিল। বলাবাহুল্য এই ধরনের স্মারক বাসনগুলি ওড়িশায় তৈরি করা হলেও তাতে বাংলায় প্রাগুক্ত কথাগুলি লেখা থাকত। পরবর্তী সময়ে অ্যালুমিনিয়ামের পাশাপাশি পিতল, কাঁসা ও তামার তৈরি স্মারক বাসনও বিক্রি হতে শুরু করে। প্রথমদিকে অল্প কিছু কথা লেখা থাকলেও ধীরে ধীরে একক জগন্নাথ ও সপার্ষদ জগন্নাথের ছবি এই ধরনের বাসনে খোদাই করা শুরু হয়। ওড়িশায় এই ধরনের বাসনের চাহিদা বাঙালি সমাজে তুঙ্গে উঠলে বঙ্গের নবদ্বীপ, শান্তিপুর অঞ্চলের ধাতুর বাসনের শিল্পীরাও এই ধরনের ধাতুর বাসন তৈরি করে ওড়িশায় বিক্রির জন্য পাঠাতে শুরু করেন। আর অজস্র বাঙালি নিজের বঙ্গদেশ থেকে ওড়িশায় রপ্তানি হওয়া সেই স্মারক বাসন পুরীধামের থেকে স্মারক হিসেবে সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে শুরু করেন। এভাবে বাংলার বাসনশিল্পে জগন্নাথের অলংকরণ শুরু হয়েছিল। এর আরও কিছুকাল পরে বাঙালি বাসনশিল্পীরা বিভিন্ন জেলার বিশেষ করে রথের মেলায় যোগদান করে এই ধরনের বাসন বিক্রি করতে থাকেন। এই ধরনের বাসনের আর একটি নতুনতর ব্যবহার এবঙ্গেই হয়েছে। তা হলো পিতল-কাঁসার বাসনেই জগন্নাথের উপাসনা। কাগজের ছাপা জগন্নাথের ছবি কাঠ ও কাচের আবরণে রেখে বাঙালি দীর্ঘদিন পূজা করেছে। পিতলের বাসনে খোদিত জগন্নাথের পাদদেশে ফুল-চন্দন দিয়ে পুজোর রীতি দুই-তিন দশক আগেও বঙ্গে প্রচলিত ছিল। এখনও বাসনের ওপর খোদাই করা জগন্নাথের ছবি পুরীতে সুলভ। এখন অবশ্য আগের মতো সরাসরি হাতে ধরে খোদাই করা হয় না, বরং সরাসরি বাসন তৈরির সময় ছাঁচে ফেলে বাসনের ওপর চাপ দিয়ে জগন্নাথের ছবিটি তুলে নেওয়া হয়। হাতে খোদাই করার সময়কালের বাসনের ওপর যে সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখা যেত তা ছাঁচ আসার পর অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। এখন একই ছাঁচে বহু বাসন তৈরি হয় বলে তাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য করার পৃথকভাবে অবকাশও আর অবশিষ্ট নেই। তাছাড়া এখন পুরীর স্মারক হিসেবে অজস্র নতুন বিষয় সহজলভ্য হয়ে গেছে। তাই স্মারক বাসনের চাহিদাও কমেছে।

১৪. তুলসীর মালায় জগন্নাথ : বৈষ্ণব সমাজে তুলসী গাছের মঞ্জরী, পাতা, ডালপালা, প্রধান কাণ্ড ও মূলের পৃথক পৃথক প্রয়োগ রয়েছে। তুলসীর পাতা ও মঞ্জরী আরাধ্য বিষ্ণু দেবতার পূজায় ব্যবহার করা হয়। তুলসী গাছের জীবনাবসানের পর তুলসীর ডালপালা দীপদানের কাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তুলসীর প্রধান কাণ্ডের ছাল খুলে নেওয়ার পর সেই কাণ্ডকে কয়েকটি প্রসেসিং-এর মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে তুলসীর মালার গুটি বা বিট তৈরি করা হয়। এছাড়া তুলসীর মূল ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে পাটাতনের ওপর ঘষে ঘষে হরিচন্দন প্রস্তুত করা হয়। তুলসীর এই বহুমাত্রিক ব্যবহার বৈষ্ণব সমাজেই একমাত্র রয়েছে। বৈষ্ণব সমাজে তুলসী একটি পূজনীয় বৃক্ষ।[২০] সাধারণত বৈষ্ণব মতাবলম্বী সাধকরা তুলসীর কাণ্ড থেকে তৈরি তুলসীর মালা প্রভূত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কণ্ঠে ধারণ করেন। তুলসীর মালার প্রধান উপকরণ তুলসীর কাণ্ড থেকে তৈরি গুটি (দানা)। প্রথমে এই গুটিগুলির ভেতর ছিদ্র করা হয়, তারপর ছিদ্রপথ দিয়ে সুতো ভরে তা গেঁথে নেওয়া হয়। তুলসীর মালায় বৈচিত্র্য আনার জন্য কয়েকটি তুলসীর গুটির অন্তর একটি করে অপেক্ষাকৃত বড় মাপের তুলসীর কাঠের ওপর খোদিত 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র বা রাধানাম লেখা তুলসীর অলংকার গেঁথে নেওয়া হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই রীতিতেও বৈচিত্র্য এসেছে। 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র বা রাধানাম লেখা তুলসীর অলংকারের মতো বড় তুলসীর কাঠে খোদিত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, নারায়ণ ও জগন্নাথকে দেখা যায়। তুলসীর কাঠে তৈরি হওয়া দেবমূর্তি বৈষ্ণব মতে নিত্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শুদ্ধ। এই ধরনের তুলসীর তৈরি অলংকার তুলসীর মালায় লকেটের কাজ করে। কোনো কোনো শিল্পী খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজের মধ্যে দিয়ে তুলসীর নরম কাঠের ওপরেই অসাধারণ দক্ষতায় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা তিনজনেরই রূপ ফুটিয়ে তোলেন। এই ধরনের শিল্প প্রায় সম্পূর্ণ হাতে ধরে করা হয়।

১৫. শঙ্খশিল্পে জগন্নাথ : বাংলার শঙ্খশিল্পের ধারাটি সুপ্রাচীন। মঙ্গলকাব্যে রয়েছে বাংলার সওদাগর বণিকরা বহির্বাণিজ্যের সময় অন্য পসরার সঙ্গে শঙ্খও পসরা হিসেবে কেনাবেচা করতেন।[২১] বঙ্গদেশে শঙ্খবণিক সম্প্রদায় এখনও রয়েছে। বঙ্গের শঙ্খের গয়না শাঁখা নামে পরিচিত। বিবাহিত সধবা নারীরা স্বামী ও সংসারের মঙ্গল কামনা করে নিয়মিত দুই হাতে শাঁখা ব্যবহার করেন। শাঁখার ওপর বিভিন্ন সূক্ষ্ম অলংকরণে সিদ্ধহস্ত বাংলার শঙ্খশিল্পীরা। শঙ্খ হিন্দুদের অন্যতম পূজার উপকরণ। পূজার কাজে শঙ্খের বিভিন্ন রকমের ব্যবহার রয়েছে। গোটা বড় শঙ্খের ওপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অলংকরণ খোদাই করেন দক্ষ শঙ্খশিল্পীরা। শঙ্খের উত্তল অংশটি প্রথমে মসৃণ করে নিয়ে তার উপরিভাগে ধার যুক্ত করাত ও অন্য যন্ত্র দিয়ে নক্‌শা তোলা হয়। শঙ্খের ওপর শৈল্পিক অলংকরণের চাহিদা তৈরি হলে প্রথমদিকে মূলত দুর্গা, গণেশ, রাধা-কৃষ্ণ ও শিবের অবয়ব ফুটিয়ে তোলা হত। এখন এই শিল্পে আরও বৈচিত্র্য এসেছে। বঙ্গ সংস্কৃতিতে ইদানীং সময়ে জগন্নাথ উপাসনার জোয়ার আসার ফলে শঙ্খশিল্পীরা শঙ্খের ওপর ফুটিয়ে তুলছেন জগন্নাথের মুখাবয়ব, একক জগন্নাথ ও সপার্ষদ জগন্নাথের রূপ। বাঁকুড়া থেকে এই ধরনের জগন্নাথের রূপ অলংকৃত শঙ্খ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। শঙ্খশিল্পের কাজ যথেষ্ট সূক্ষ্ম, সময়সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য। শঙ্খের গুণগত মান ও শঙ্খের ওপর খোদিত অলংকরণ কতটা সূক্ষ্ম তার ওপরে নির্ভর করে শঙ্খের দাম নির্ধারণ করা হয়। বাংলার শঙ্খশিল্পগুলি ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় বাজারে যথেষ্ট দামে বিক্রি করা হয়।

১৬. শোলাশিল্পে জগন্নাথ : বাংলার প্রাচীন লোকশিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম স্থানে রয়েছে শোলাশিল্প। শোলা বাংলার একটি জলজ ফসল। প্রাকৃতিক শোলার পাশাপাশি রাসায়নিক থার্মোকল বাজারে প্রচলিত রয়েছে। তা বাংলার শোলাশিল্পে প্রভাবও ফেলেছে। কিন্তু বঙ্গের শোলাশিল্পে প্রাকৃতিক শোলার যে সাবেকি আভিজাত্য রয়েছে তা এখনও থার্মোকল গ্রাস করতে পারেনি। প্রাকৃতিক শোলাকে নির্দিষ্ট কয়েকটি উপায়ে এই শিল্পে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হয়। বাইরের তন্তু ও আঁশ থেকে শোলার মূল সাদা অংশটি আলাদা করে নেওয়া হয়। এরপর শোলার নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী তা সাজিয়ে প্রয়োজন মতো উচ্চতায় তা কেটে নেওয়া হয়। কেটে রাখা শোলার ওপর ক্ষুরধার ছুরি দিয়ে বিভিন্ন নক্‌শা তুলে তারপর সেটি নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী কেটে নেওয়া হয়। প্রয়োজন মতো শোলার কয়েকটি অংশ আগে কেটে তারপর সেগুলি অন্য শোলার সঙ্গে আঠা ও সুতো দিয়ে আটকিয়ে এক একটি অনবদ্য শিল্প গড়ে তোলেন শিল্পীরা। সম্প্রতি হুগলি জেলার চন্দননগর অঞ্চলের একটি মণ্ডপে জগদ্ধাত্রী দেবীর ডাকের সাজসজ্জায় জগন্নাথের অলংকরণ দেখা গেছে। এখন শোলাশিল্পের বিভিন্ন উপকরণ ত্রিমাত্রিক ফ্রেম করে সংরক্ষণ করেন অনেকে। এই ধরনের ফ্রেমগুলি সাধারণত গৃহসজ্জায় কাজে লাগে। পশ্চিমবঙ্গের একাধিক হস্তশিল্পকেন্দ্রে শোলার তৈরি জগন্নাথকে এভাবে ফ্রেমিং করা হয়।

১৭. সুতোর রেখায় জগন্নাথ : বাংলার মেয়েরা অসাধারণ সব সুতোর কাজ করেন। মেশিন থেকে তৈরি সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারির যুগের আগেও বাংলার মেয়েরা সুতোর কাজে করিৎকর্মা ছিলেন। তারা তাদের অবসর সময়ে বিভিন্ন মাপের পুরানো রঙিন কাপড়ের পারের অংশ থেকে রঙিন মোটা সুতো সংগ্রহ করে রাখতেন। তারপর সেগুলি সংগ্রহ করে রাখতেন। অল্প ব্যবহৃত বা প্রায় নতুন কাপড়ের কাঁথার ওপর সংগৃহীত সুতো দিয়ে নতুন নতুন রঙিন নক্‌শা ফুটিয়ে তুলতেন তাঁরা। মূলত লতাপাতা, ব্রতের আলপনা, বিভিন্ন ফল-ফুল, নর-নারী, পাখি, পশু, নানা যানবাহন ও বিভিন্ন ছড়া হয়ে উঠত নক্‌শার মূল বিষয়বস্তু। এগুলিই একসময় মেয়েদের অবসর বিনোদনের মাধ্যম ছিল। এছাড়াও সূঁচ ও উলের খেলায় তারা সাজিয়ে তুলতেন বসার আসন। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই চেয়ার-টেবিলে খাওয়ার রেওয়াজ তৈরির আগে পর্যন্ত বসার আসনের নিয়মিত ব্যবহার ছিল। এখন তা কমতে কমতে পূজার্চনার সময়ে ব্যবহৃত আসনে এসে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাংলার লোকশিল্পে

সুতোর রেখায় জগন্নাথ চিত্রিত হয়েছেন মূলত মেয়েদের হাতের স্পর্শে। মাত্র দুই দশক আগেও বাঙালি মেয়েরা শখের বসে কাপড়ের ওপর রঙিন সুতোর কাজ করে তা ফ্রেমে বাঁধিয়ে সংরক্ষণ করতেন। বাংলার সুতোর শিল্পে জগন্নাথের প্রসার খুব বেশি না ঘটলেও একেবারেই যে ঘটেনি তা বলা যায় না।

১৮. চিনেমাটির জগন্নাথ : বিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশক জুড়ে কড়ি বা চিনেমাটির বিভিন্ন দেববিগ্রহ তৈরির রেওয়াজ শুরু হলে সেই সময় একই পদ্ধতিতে সপার্ষদ জগন্নাথ বিগ্রহ তৈরি হয়েছে। অবশ্য একথাও ঠিক যে, বিশ্বায়নের ধাক্কায় বর্তমান সময়ে চিনেমাটির জগন্নাথ প্রায় অপ্রচলিত হয়ে গেছে। এখন আর চিনেমাটির জগন্নাথ পাওয়া যায় না বা তৈরি হয় না।

১৯. গালার তৈরি জগন্নাথ : সাম্প্রতিককালে প্রাচীন ঐতিহ্যের বিভিন্ন ধারাতেও উপাদানের পার্থক্য এসেছে। যেমন মাটির তৈরি ছাঁচের জগন্নাথে এখন ছাঁচে ফেলে তৈরি করা হলেও সিমেন্ট, প্যারিস, সাদা পুট্টি, মডিউলার ক্লে দিয়ে মূর্তি তৈরি করা হচ্ছে। তেমনই এখন রঙিন গালা থেকেও বহু যত্নে ছোট ছোট জগন্নাথ বিগ্রহ তৈরি করা হয়। এই ধরনের জগন্নাথের সঙ্গে বাংলার হাতে টেপা মাটির পুতুলের আংশিক মিল রয়েছে। বলাবাহুল্য এই রীতিটি অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত।

২০. ঝিনুকের তৈরি জগন্নাথ : দিঘা সমুদ্র সৈকত অঞ্চলে ইদানিং ঝিনুকের তৈরি জগন্নাথ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দিঘার সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন আকারের শামুক, ঝিনুক, কড়ি সংগ্রহ করে তা পালিশ করার পর একটি বিশেষ ধরনের আঠার সাহায্যে সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী জুড়ে নেওয়া হয়। তারপর রঙ ও বার্নিশের কাজ করে প্রয়োজনীয় রূপ দেওয়া হয়। অনেক আগে থেকেই এইভাবে ঝিনুকের তৈরি কালী, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশের মূর্তি তৈরি করা হতো। সাম্প্রতিক সময়ে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অনুকরণে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি হচ্ছে। ফলে জগন্নাথ সংস্কৃতির একটি ছায়া এই অঞ্চলেও দেখা যাচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে এই ধরনের জগন্নাথ বিগ্রহ তৈরি করতে আগ্রহী হয়েছেন স্থানীয় শিল্পীরা।

মধ্যযুগের সময়পর্বে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এসে পড়েছিল বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির প্রায় প্রতিটি ধারায়। চৈতন্য মহাপ্রভুই বাঙালিকে জগন্নাথ মহাপ্রভুর এতটা কাছে নিয়ে এসেছেন। আবার অন্যভাবে বলা যায় চৈতন্যদেবের জন্যই জগন্নাথ মহাপ্রভু বাঙালির এত কাছে এসে ধরা দিয়েছেন। একটানা পাঁচ শতাব্দী ধরে সেই শুভফল বাঙালি জাতি আস্বাদন করে চলেছে। বাংলা ও বাঙালির লোকজীবনে জগন্নাথ প্রবেশ করেছেন বাঙালির ভাবনায় সজ্জিত হয়ে এক নতুন বা স্বতন্ত্র চেহারায়। তিনি যেন উৎকলের ভূমিতে তাঁর ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্বরূপকে সংহত করে বঙ্গভূমে স্ব স্বরূপ বজায় রেখেও নতুন ও নতুনতর রূপে সাজতে এসেছেন। তাই বাংলার লোকশিল্পের পরিসরে জগন্নাথকে ঘিরে এত বৈচিত্র্য এসেছে।

Reference:

১. Bakker, Hass T., *The World of the Skandapurana (Northern India in the Sixth and Seventh Centuries)*, New Edition, Brill, Boston, 2004, p. 3-4
২. তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পাদিত), 'স্কন্দপুরাণম্', দ্বিতীয় সংস্করণ, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৪৩
৩. ভারতী, শিবশঙ্কর, "পুরীর জগন্নাথদেবের ছাপান্নভোগে কী কী থাকে?", 'সাপ্তাহিক বর্তমান', ১০ জুলাই, ২০১০, পৃ. ৯
৪. ভূঞা, ড. কৃষ্ণচন্দ্র, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতারে ওড়িয়া', প্রথম সংস্করণ, ইন্দিরা আকাদেমি, ভুবনেশ্বর, ২০১০, পৃ. ৩১০
৫. রায় ভট্ট, অমূল্যধন, 'শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল বা শ্রীপাটের ইতিবৃত্ত', প্রথম সংস্করণ, মানসী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৩১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 420 - 432
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৯
৬. গোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', প্রথম সংস্করণ, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২০২১, পৃ. ১৫৪
৭. মিত্র, অশোক, 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, ভারতের জনগণনা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৬১, পৃ. ৬১৪-৬১৫
৮. মুখোপাধ্যায়, সোমা, 'বাংলার জগন্নাথ', প্রথম সংস্করণ, তবুও প্রয়াস, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৭৬-৭৭
৯. রায় ভট্ট, অমূল্যধন, 'শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল বা শ্রীপাটের ইতিবৃত্ত', পৃ. ১৪৩
১০. শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ, শ্লোক : ১১/২৭/১২
১১. লাহা, হৃদয়চন্দ্র, 'দারুরূপে জগন্নাথ দেবের আবির্ভাব ও স্বরূপদর্শন', প্রথম সংস্করণ, বাণী প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৯১১, পৃ. জগন্নাথের ছবি এছাড়াও দ্রষ্টব্য রাধামাধব ঘোষ, রামসহায় অবষি, রাজর্ষি গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী প্রমুখের গ্রন্থে মুদ্রিত জগন্নাথের ছবি।
১২. দেবী, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি, "শ্রীশ্রীমায়ের কথা", 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' (তৃতীয় খণ্ড), স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (সংকলিত ও সম্পাদিত), প্রথম সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৪৮৭
১৩. শ্রীমদ্ভগবত-মহাপুরাণ, শ্লোক : ১১/২৭/১২
১৪. *Lord Chaitanya's Jagannath Deities*, Publishing Date : 11-08-2016, Internet archive edition, Visiting Date : 06-04-2024, Time : 09.26 PM, weblink : https://www.bvmlu.org/SCM/deities/index.html
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র', প্রথম সংস্করণ (নূতন), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ , পৃ. ১১১
১৬. পাল, অভিজিৎ, "শ্রীচৈতন্যপ্রভায় উদ্ভাসিত মৃৎ-জগন্নাথ", 'গৌর-বৈজয়ন্তী', প্রথম সংস্করণ, গৌড়ীয় মিশন, কলকাতা, ২০২৪, পৃ. ২০-২১
১৭. রায়, যামিনী, "পটুয়া শিল্প", 'একালের প্রবন্ধ সঞ্চয়ন', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক সংকলিত, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৪৪-৪৫
১৮. সিংহ মহাপাত্র, রামামৃত, 'মল্লভূমের দশাবতার তাস', প্রথম সংস্করণ, সুপ্রকাশ, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৭
১৯. চন্দ্র, মনোরঞ্জন, 'মল্লভূম বিষ্ণুপুর', প্রথম সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২৮৩
২০. পদ্মপুরাণ, শ্লোক : ২/১১-১৭
২১. নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদিত), 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' (ধনপতি পালা), প্রথম সংস্করণ, বিদ্যা, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১০৬